জাতীয়তার প্রসারে নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা বিমলেশপ্রাণা

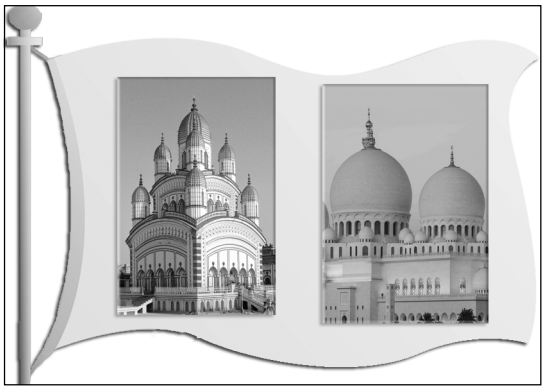

স্বামী বিবেকানন্দের আশিস শিরে ধারণ করে ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষের 'সেবিকা, বান্ধবী, মাতা।' তাঁর অবশিষ্ট জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যাপিত হয়েছিল ভারতেরই জন্য। পরাধীন ভারতের অশেষ দুর্গতি দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, স্বাধীন না হলে ভারতবাসীর উন্নতির কোনও আশা নেই এবং স্বাধীনতার জন্য প্রথম প্রয়োজন জাতীয়তাবোধের প্রসার—যা গড়ে তুলবে জাতীয় আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলন বলতে নিবেদিতা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন ভাবেননি; তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব সবকিছুই তার অঙ্গীভূত হবে। জাতীয় নবজাগরণকেই নিবেদিতা 'জাতীয়তা' বলে অভিহিত করতেন। সেই জাতীয়তার প্রসারে তাঁর অক্লান্ত কর্মকাণ্ড আজ ইতিহাস। আমরা তারই সামান্য দিগ্‌দর্শন করব।

নাগপুরের জি ভি দেশমুখ 'Prabuddha Bharata' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৫৩ সংখ্যায় যে-স্মৃতিচারণ করেছিলেন তা থেকে জানা যায়, নিবেদিতা ১৯০২ সালে নাগপুরে গিয়েছিলেন মরিস কলেজের ছাত্রদের আমন্ত্রণে, যেখানে সভানেত্রী হিসাবে তিনি সফল ক্রিকেটারদের পুরস্কৃত করবেন। দিনটি ছিল দশেরার আগের দিন—অস্ত্রপূজার দিন। নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করলেও ছাত্রদের ধমক দিলেন—কেন তারা স্বদেশি খেলাকে অবহেলা করে বিদেশি খেলা খেলে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছে। তিনি এমনও বললেন, এটি যদি আগে জানতে পারতেন তাহলে সভানেত্রীত্ব করতে রাজি হতেন না। অস্ত্রপূজার এই দিনে একমাত্র দেবী দুর্গার অর্চনা করাই উচিত ছিল, যিনি শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। ভগিনী বিস্মিত—তারা কীভাবে দেবী দুর্গাকে ভুলে গেল—ভুলে গেল তাঁর খড়্গকে—তাঁর শক্তির বাণীকে!! তিনি আশা করেছিলেন ভোঁসলে রাজাদের রাজধানীতে এসে মারাঠা বীরত্বের কিছু চিহ্ন দেখতে পাবেন।

সভায় তাঁর এমন কঠোর তিরস্কার শুনে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক যখন চলে যেতে উদ্যত তখনই নিবেদিতা বলে বসলেন—তিনি পরদিন তরবারি খেলা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি সামরিক কার্যকলাপ দেখতে চান। ওই ধরনের উপযুক্ত ছাত্র কলেজে বিশেষ না থাকলেও অনেক চেষ্টায় পরদিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হল। যেসব যুবক আখড়ায় গিয়ে তরবারি চালানো, লাঠিখেলা, মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি অভ্যাস করত, কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা তাদের অবজ্ঞা

করেন জেনে নিবেদিতা তাঁর বজ্রবাণীর দ্বারা কেবলমাত্র সেইসময়ের ভারতীয় ছাত্রদেরই নয়, বর্তমান প্রজন্মকেও শিক্ষা দিয়েছেন : ''আমরা এখন বেশিরকম উচ্চশিক্ষা পাচ্ছি, অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুচ্ছে, যারা একেবারে ভগ্নদেহ, বিপদের কালে আত্মরক্ষা করতে পারে না, নিজেদের মা-বোনের মর্যাদা রাখতে পারে না। এইসব ধ্বংসপুঞ্জ দিয়ে সমাজের কোনো উপকার নেই। দেশ চায় দেহে-মনে বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের; দেশ চায় না সেইসব লোককে যারা বিদেশী সরকারের সেবা করে থাকে, সেইসঙ্গে স্বদেশীয়দের উপর চড়াও হয়। বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিকরাই কেবল দেশকে তুলতে পারবে। বিদেশী সরকারের দাসত্ব করে, তাদের স্বৈরতন্ত্রী শাসনকে বলবৎ করার কাজ করতে তোমাদের মনে ঘৃণা আসা উচিত।''[১]

ভারতের যুবশক্তির উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ক্রান্তদর্শী ঋষি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে কার্যকরী করতে ভগিনী নিজেকে তিলে তিলে ভারতের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯০৪ সালে পাটনায় তিনি ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা করেন। সেখানে—'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকা অনুযায়ী—হিন্দু ধর্মের সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে তিনি ভারতবাসীরা কীভাবে জাতি হিসাবে যথার্থ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে তারই বাস্তব উপায় নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ''বালকদের মুখে অপরিমেয় শান্তি দেখলে আমি দুঃখিত হব।... আমি চাই, তোমরা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ করো, বক্সিং করো, তরবারি খেলো। শান্তশিষ্ট গোবেচারা লোক চাই না—চাই শক্তিধর মানুষ।'' শুধু দৈহিকভাবে বলশালী হওয়াই যথেষ্ট নয়, নিবেদিতা চাইতেন যুবকরা বীর হবে, তারা লড়াই করবে, অথচ তাতে নীচতা বা তিক্ততা যেন না থাকে। যখন সংগ্রামের ডাক আসবে, যেন তারা সাড়া দেয়, ঘুমিয়ে না থাকে।[২] তিনি চাইতেন শিবাজী, রাণাপ্রতাপের মতো বীর সন্তানের প্রসূতি ভারতমাতার বর্তমান সন্তানেরা যেন তাঁদেরই মতো বীর হয় এবং নিজের মর্যাদা ও দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।

নিবেদিতা ভারতবাসীর জননীর স্থান অধিকার করে আপন সন্তানদের ক্লীব, নপুংসক, ভীরুরূপে দেখতে চাননি। তিনি বুঝেছিলেন, একদা বীর জাতি আজ মনোবল খুইয়ে মেরুদণ্ডহীন, নির্জীব পশুতে পরিণত হয়েছে। যদি এরা একবার নিজের প্রকৃত সত্তা ফিরে পায় তাহলে কোনও জাতি এদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন, জাতীয়তার প্রসারে ইতিহাসের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সহজে যে-কোনও বিষয় বুঝতে পারে। তাই জাতীয়তাবোধ প্রচার ও প্রসারকল্পে, তাঁর মতে, ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বলেন, ''এখনি আরম্ভ করে দাও ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা,... আমরা চাই শিশুরা, অশিক্ষিতরা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোট বেঁধে এইসব ভূমিকায় অংশ নিক, যাতে তারা স্বদেশের ইতিহাসচেতনা লাভ করে।... বারো থেকে কুড়িটি 'দৃশ্য' গাড়ি করে অগ্রসর হবে, সামনে শঙ্খবাদকেরা, পিছনে যন্ত্রসঙ্গীত, সঙ্গে ধ্বজপতাকা। সর্বশেষ দৃশ্যটিতে দেখা যাবে, আধুনিক ভারত, শোকাভিভূত আকারে। শোভাযাত্রা দিবসকালেও হতে পারে, কিন্তু রাত্রেই সুন্দর—সার সার জ্বলন্ত মশাল, মাঝে মাঝে তাতে ইন্ধন নিক্ষেপ, আর উচ্ছ্বসিত অগ্নিঝলক।...

''এইভাবে, শোভাযাত্রার সময়টিতে, সমস্ত শহরটি যেন একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, সে এমন বিদ্যালয় যার আছে হৃদয়—সেইসঙ্গে মস্তিষ্ক।''[৩]

ভারতীয়রা নিজেদের অতীত গৌরব জানতে পারলে বর্তমান গঠনেও উৎসাহী হবে। তাই তিনি

ভারতের ঐতিহাসিক নগরীগুলির ট্যাবলোর পরিকল্পনাও করেছিলেন। ঐতিহাসিক শোভাযাত্রায় দিল্লি, চিতোর, বারাণসী, পুনা প্রভৃতি নগরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এক-একটি মূক অভিনেতার দল। তাদের সাজ-পোশাক হবে বর্ণময়—নাটকীয় বাস্তবতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে যেসব নগরী প্রাধান্য পেয়েছে তারা ক্রমান্বয়ে আসবে, সকলের কেন্দ্রে থাকবে দিল্লি।[৪]

জীবন ও চেতনার প্রতীক বা জাতীয় প্রতীক হল পতাকা। ভারতের কোনও জাতীয় প্রতীক নেই দেখে, ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণকালে ভগিনী বজ্রচিহ্ন দেখতে পান ও সেটিকে অবিলম্বে জাতীয় প্রতীক করতে চান। পুরাকালে ও মধ্যযুগে ভারতের ছোট-বড় রাজাদের নামাঙ্কিত ধ্বজা বা পতাকা তাঁদের প্রতীক হয়ে ঘোড়া বা রথের মাথায় শোভা পেত। কিন্তু পরাধীন ভারতে ইংরেজের পতাকা সর্বত্র উড্ডীয়মান থাকত। ভারতীয়রা তাদের অতীত গৌরব, পতাকা সবকিছুকে বিস্মৃত হয়েছিল। ভগিনী ভারতের হৃতগৌরবকে ফেরাতে এই প্রতীক বা পতাকার চিন্তা করেছিলেন। তাঁর একটি চিঠির কিছু অংশ (২৫ জুলাই ১৯০৬) : ''আমি বজ্রকে ভারতের প্রতীক করতে চাই... ওটি বুদ্ধের চিহ্ন। ওটি শিবের ত্রিশূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বামীজী নিজেকে বজ্র বলতেন। তদুপরি এটি 'প্রতিমা' নয়, সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। দুর্গা বজ্রকে তাঁর একহস্তে ধারণ করেন।''[৫] যদিও বজ্র চিহ্নটিকে স্বাধীন ভারত পতাকার চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করেনি কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, পরে যাঁরা ভারতের পতাকার পরিকল্পনা করেছেন তার পেছনে আছে এই দূরদর্শিনীর ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি।

ধর্মবিদ্বেষ যেন জাতীয় ক্ষেত্রে সংহতি ব্যাহত করতে না পারে সেদিকেও ভগিনীর দৃষ্টি ছিল। ভারত সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানবাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করে কোন যুগ থেকে সম্মুখে পা বাড়িয়েছে! শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' মতকে সামনে আদর্শ করে নিবেদিতা পাটনায় একটি বক্তৃতায় (The Educational Problem in India) বলেছিলেন, ''ঐ জীবনই (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন) কেবল তোমাদের শেখাতে পারে, কিভাবে একজন হিন্দু একজন মুসলমানকে ভালবাসতে পারে এবং একজন মুসলমান পারে হিন্দুকে।'' ২০ মার্চ ১৯০৪ কলকাতা মাদ্রাসায় বক্তৃতাকালে নিবেদিতা বলেন, ''ভারতীয় মুসলমানদের কর্তব্য আজ আরবের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা নয়... তাদের কর্তব্য ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা, ভারতের জাতীয় ভাবস্রোতে নিজেদের নিক্ষেপ করা।... ঐ প্রবল জাতীয় শক্তি তাদেরও—ঐতিহ্যগত কারণে। কারণ তারা ওই ঐতিহ্যেরই সন্তান।''[৬]

১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে নিবেদিতা হিন্দু শ্রোতাদের বলেছেন : ''ধরা যাক, তোমরা বাঙালী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছ—সেক্ষেত্রে তোমাদের একই ভ্রাতৃসংঘে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই তো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখানে তাহলে তোমাদের সংকীর্ণ গোঁড়ামি ভুলে যাওয়ার কথা আসছে, কারণ তাহলেই কেবল তোমরা তোমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি বোধ করতে পারবে।'' ভারতে কত বিভিন্ন ধরনের মতসংঘর্ষ চলেছে তার বিবরণ দেওয়ার পরে নিবেদিতা এই আবেদন করেছিলেন : ''পরস্পরের কুৎসা করে আমরা যেন শক্তিক্ষয় না করি—এবং তার দ্বারা পথ-চলতি দর্শকের ঘৃণাপূর্ণ হাসির পাত্র না হই।''[৭]

ভগিনী জন্মসূত্রে বিদেশিনী হয়েও গুরুর মাতৃভূমিকে নিজের রক্তমজ্জার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন, তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হত

ভারতের আত্মা, ভারতের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আশা-নিরাশা, সর্বোপরি হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার। তাই তিনি যুবকদের বারবার বলেছেন : ইউরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক দৃশ্য দর্শনে মোহিত হোয়ো না। ভারতীয়রা ভাবছে ইউরোপের নকল করে কতকগুলি বিবদমান দল তৈরি করলেই পাশ্চাত্য দেশপ্রেমের তেজবীর্য এসে যাবে। ইউরোপের কাছ থেকে তরুণ ভারত শিখতে চাইছে কী? না—''পারস্পরিক অভিযোগ, প্রতি-অভিযোগ এবং পারস্পরিক আক্রমণ, নিন্দা ও নৈরাশ্যের রোষজ্বালা, বিপথচালিত কর্ম ও বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক চিন্তা।''—এইসব পরিহার্য বিষয়কে নকল না করতে তরুণদের অনুরোধ করেছেন তিনি।

তার পরিবর্তে যুবকদের যে-বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে বলে তিনি মনে করতেন তা হল—''সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা—যা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবোধের, এবং ভূমির সঙ্গে জীবনের ঐক্যবোধের ভিত্তিতে প্রদত্ত হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে নারীকে, স্পর্শ করতে হবে অশিক্ষিত, অসহায়, অস্ফুটবাক জনগণকে।'' জোরালো ভাষায় নিবেদিতা বলেছেন, ''ছাত্র-প্রচারকরা ম্যাজিক লণ্ঠন,... ভারতের মানচিত্র নিয়ে ভারত-ভ্রমণ করুক, তাদের হৃদয় মন পূর্ণ থাক গাথা ও কাহিনীতে এবং ভৌগোলিক বিবরণে।... সমস্ত কিছুর ধুয়া শেষপর্যন্ত হোক—ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!''[৮]

ভারতবর্ষকে সুন্দরী, সুসজ্জিতা, সুশিক্ষিতা, সর্বগুণসম্পন্না, বীরজননী; ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি তথা কলা, সংগীত, শিল্প সবকিছুতে অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞীরূপে দেখতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তাঁর অতুলনীয় অন্তর্দৃষ্টি, ও ভারতপ্রেম দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এম শ্রীনিবাস আয়ার নির্দ্বিধায় বলেছেন : ''সাম্প্রতিক কালে এঁর (নিবেদিতা) তুল্য আর কেউ আমাদের মধ্যে নেই যিনি জাতীয় সংহতি এবং জাতীয় ন্যায়বিধানে অধিক কাজ করেছেন।... তাঁর জীবন এবং কীর্তি ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত, তা ভারতের বিজয়ী আত্মঘোষণা।''[৯]

নিবেদিতা যেমন ভারতের সমাজ, মানুষ, ভাবধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনই সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষত জাতীয় ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। একটি ঘটনা স্মরণ করি। ভারতবর্ষ সত্যের সাধক। তার শাস্ত্রে পরম লক্ষ্যের অপর নাম সত্য। 'সত্যমেব জয়তে' তার জাতীয় বাণী। তবু পরাধীন হীনম্মন্য ভারতীয়দের সামনে ভাইসরয় লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন-সভায় বলতে সাহস পেয়েছিলেন (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫) : ''প্রাচ্যবাসীরা অসত্যভাষী, তাদের ক্লাসিকসমূহে অবিমিশ্র সত্যের উপস্থাপনা নেই, ভারতীয়রা তোষামোদকারী, কুৎসা-সুখী ইত্যাদি...।'' হলভর্তি প্রবীণ ও নবীন সুশিক্ষিত ভারতীয় বিনা প্রতিবাদে একথা শুনলেন এবং হজম করলেন। সহ্য করতে পারলেন না শুধু ভগিনী নিবেদিতা। উত্তেজিত ভগিনী সভা থেকে স্যার গুরুদাস ব্যানার্জিকে নিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে লর্ড কার্জনের লেখা 'Problems of the East' পুস্তকটি বের করলেন। তাতে এক স্থানে কার্জন লিখছেন কোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা। তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে নিজের বয়স নিয়ে নির্জলা মিথ্যা বলেছিলেন এবং রাজপরিবারে নিজের বিবাহের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও মিথ্যা চতুর ইঙ্গিত করেছিলেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকায় নিবেদিতা ছদ্মনামে সেটি হুবহু তুলে দিলেন। অবশ্য প্রায় কেউই জানতে পারেননি একাজ কার। এক বিখ্যাত ইংরেজ

সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন, এটি করেছেন কোনও অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হিন্দু।

তার পরদিন ইংরেজদের কাগজ স্টেটসম্যান আবার সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে। এছাড়া ১২ তারিখেই কার্জনের বক্তৃতার প্রথম প্রতিবাদ করেছিল স্টেটসম্যান পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে। সেইসময় নিবেদিতা নিয়মিত স্টেটসম্যানে লিখতেন, কখনও কখনও সম্পাদকীয় পর্যন্ত। উক্ত সম্পাদকীয়টি যদিও র‍্যাটক্লিফের বলেই মনে করা হয়, তবু তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা বিবেচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় লেখাটি নিবেদিতারই প্রভাবের ফল। ১৪ ফেব্রুয়ারি স্টেটসম্যানে ভগিনী 'এক্স' ছদ্মনামে এ-বিষয়ে একটি দীর্ঘ এবং শক্তিশালী পত্রপ্রবন্ধও লেখেন ('The Highest Ideals of Truth')।

এক্ষেত্রে ভারতীয় ছাত্রদের কাপুরুষতা নিবেদিতাকে মর্মন্তুদ পীড়া দিয়েছিল। তিনি লেখেন : ''ছাত্রদের উদ্দেশ্য করেই (কার্জন) ওইসকল (অপমানজনক) কথা বলেছিলেন—আর ছাত্ররা সেসব গ্রহণ করেছিল 'নিখুঁত নীরবতায়'। তারা ভালই করেছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ভাল বোধ হয় না যখন ভাবি যে, ওই ছাত্ররা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে, তাদের জাতির নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে, আনীত অভিযোগ শুনে গেল—কিন্তু প্রতিবাদে শব্দমাত্র উচ্চারণ করার মতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠল না।"

নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে অমৃতবাজার ও স্টেটসম্যান পত্রিকা এভাবে কার্জনের কথার প্রতিবাদ করার পর অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিতে অনবরত প্রতিবাদী সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রবল আন্দোলন। দেশীয় কাগজগুলি সৃষ্টি করে সর্বভারতীয় আলোড়ন, যা কিছু পরিমাণে পরবর্তী আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি এনে দিয়েছিল। কার্জনের কটূক্তি ও তাঁর ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে 'জনাকীর্ণ প্রকাণ্ড এক সভা' হয়েছিল। ভারতবর্ষের সর্বত্র এধরনের সভার আয়োজন করা হয়েছিল।[১০] বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বজ্রটি নিবেদিতা এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন যার পরিণাম হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ভিত্তি হল জাতীয়তাবোধ। দাক্ষিণাত্যে একটি সভায় ভারতের ঐক্য সম্পর্কে নিজের মত ব্যাখ্যা করে নিবেদিতা বলেছিলেন, ''আমি আপনাদের নিকট একটি মাত্র শব্দ স্থাপিত করতে চাই, যে শব্দ আপনাদের প্রতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যেন উচ্চারিত হয়—সেটি হল 'জাতীয়তা'।"[১১] ভারতে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সেই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি ও প্রসারে নিবেদিতার ভূমিকা যেটুকু আমাদের গোচরে এসেছে তা সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের অগ্রভাগটুকুর মতো, অর্থাৎ অতি সামান্যই দৃশ্যমান। সেই অদ্ভুত কর্মবীরাঙ্গনার কার্যকলাপ যতটুকু জানা যায় তাতেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। ✠

তথ্যসূত্র

১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৯৪), খণ্ড ২, পৃঃ ১৩২-৩৩
২। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৩৩
৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৫২-৫৩
৪। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৫১-৫২
৫। তদেব, পৃঃ ১৫৫
৬। তদেব, পৃঃ ২৬২
৭। তদেব
৮। তদেব, পৃঃ ২৬৩
৯। তদেব, পৃঃ ১০
১০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৩৪-৪১
১১। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ২৩৭